একক ৩০ ❐ বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন

গঠন

৩০.১ উদ্দেশ্য

৩০.২ প্রস্তাবনা

৩০.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

৩০.৪ ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ প্রক্রিয়া

৩০.৫ বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন

৩০.৬ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ অনুশীলনী

৩০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে একটি অনিবার্য নিয়ম হিসাবে বুঝতে পারবেন।
- ধ্বনির পরিবর্তন ঘটাবার পিছনে সক্রিয় কারণগুলি খুঁজে নিতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন যে কয়টি সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে, সেগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে পারবেন।
- বাংলাভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৩০.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষায় সময়ের সঙ্গেসঙ্গে যে-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ নিহিত থাকে ওই ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্যে। প্রতি মুহূর্তে লোকমুখে ব্যবহৃত হ'তে হ'তে, আমাদের অজ্ঞাতেই এই ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তনের ব্যাপারটি এত সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, আমরা দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের অসচেতন চেষ্টায় তা টের পাই না। দীর্ঘদিন বা সুদূরস্থানের ব্যবধান ঘটলে, তখন আমাদের কানে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটি ধরা পড়ে।

বক্তার মুখ থেকে শোনা বাক্য বা ধ্বনিসমষ্টি শ্রোতার কানে পৌঁছলে তবে ভাষার মাধ্যমে মনের ভাবের বিনিময় ঘটেছে—আমরা বলতে পারি। কিন্তু এই বক্তার বলা ও শ্রোতার শোনার মধ্যে অনেকরকম স্খলন বা

ত্রুটি ঘটতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে এই ত্রুটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই ঘটনাটি পরম্পরাক্রমে চলতে থাকলে, একটা সময় আসে যখন মূলের সঙ্গো পরিবর্তিত ধ্বনির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধ্বনির এই মূল রূপ এবং পরিবর্তিত রূপের বিবর্তনের পথটিকে চিনতে হলে যে-শব্দের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন ঘটেছে তারও মূলরূপটিকে আমাদের জেনে নিতে হয়। তাছাড়া ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাটিকে সামগ্রিকভাবে বুঝে নিয়ে, কেন পরিবর্তন ঘটে—সেই কারণও আমরা নির্ণয় করতে পারি। উপরন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করলে এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিচিত্র প্রকাশরূপের মধ্য থেকে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্রও নির্দিষ্ট করে নিতে পারি।

আসুন, আমরা ক্রমান্বয়ে ধ্বনিপরিবর্তনে দায়ী কারণগুলিকে এবং পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলিকে প্রথম বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

৩০.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমুহকে নানাজন নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন। এই সবগুলি মতের সমবায়ে প্রধানত একটি সিদ্ধান্ত আমরা প্রাথমিকভাবেই করতে পারি—ধ্বনিপরিবর্তনের জন্য দায়ী দুটি কারণ, একটি—ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব এবং অন্যটি আভ্যন্তরীণ। এই বাহ্য বা বহিঃপ্রভাবজাত কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যভাষার সংশ্রব, বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রভাব বা লিপিবিভ্রাট। আভ্যন্তরীণ কারণগুলি প্রধানত নির্ভর করে ভাষাব্যবহারকারী বক্তা ও শ্রাতার উপর—বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার সঠিক না শুনতে পাওয়া, দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারণবিকৃতি, উচ্চারণের প্রয়াস লাঘব এবং সর্বোপরি বক্তা-শ্রোতার মানসিক কিছু কারণ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আসুন, আমরা নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে এই কারণগুলিকে চিহ্নিত করি—

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব।

(খ) ধ্বনিপরিবর্তনের বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ।

(গ) ধ্বনিপরিবর্তনের বক্ত-শ্রোতার মানসিক কারণ।

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব ঃ

ভিন্ন ভাষার প্রভাব—কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সংশ্রবে এলে একভাষার কিছু ধ্বনির অন্যভাষায় সংক্রামিত হতে পারে। যেমন আররি ও ইংরেজিভাষার সংস্পর্শে বাংলার ওষ্ঠধ্বনি 'ফ' রূপান্তরিত হয়েছে দন্তোষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনিতে।

ব্যক্তিগত প্রভাব—কোনো পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণরীতি অপর কোনো ব্যক্তির উচ্চারণ বা সামগ্রিকভাবে ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন আনতে পারে। 'শ' ধ্বনিটির এইরকম বিশিষ্ট উচ্চারণ আজকাল রেডিও বা দূরদর্শনের ঘোষক-ঘোষিকার মুখে হয়ত শুনে থাকবেন।

লিপিবিভ্রাট—কোনো একভাষার শব্দ অপর ভাষায় শিখতে গেলে, সমধ্বনিপ্রকাশক বর্ণের অভাবে অনেক সময় কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসা হয়। এরফলে ধ্বনিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যেমন—চিনের রাজধানীর নাম পিকিং/পেইচিং/বেইজিং নানারকমভাবে লেখা হয়, অথচ এর কোনোটিই চিনাভাষায় মূল

উচ্চারণের সদৃশ নয়। ইংরেজি নামকরণেও দেখবেন এরকম ধ্বনিবিভ্রাট অনেক হয়েছে, যেমন—'কলকাতা' হয়েছে 'ক্যালকাটা', পদবী 'বসু' হয়েছে 'বোস'।

(খ) বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি—জিহ্বার জড়তা থাকলে অনেক সময় কোনো ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারিত না হয়ে ভিন্নতর রূপ লাভ করে। যেমন সংস্কৃত 'ষ' ধ্বনিটি বাংলায় 'শ'-এ পরিণত হয়েছে।

শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি—শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে বক্তার কথা যথাযথভাবে তিনি শুনতে পাবেন না। সেক্ষেত্রেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। তবে এরকম পরিবর্তন সামগ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

উচ্চারণে অক্ষমতা—অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দুরুচ্চার্য শব্দ বা বিদেশি শব্দ উচ্চারণে অনেক সময় এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। যেমন—ইংরেজি Box শব্দটি আমাদের উচ্চারণে হয়েছে 'বাকস্' বা বেঞ্চ > বেঞ্চি। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে পাই তিনি 'উষ্ট্র'কে বলেছিলেন 'উট্র'।

উচ্চারণে দ্রুততা—খুব তাড়াতাড়ি কথা বলার সময় শব্দমধ্যস্থ কোনো ধ্বনি স্খলিত হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। যেমন—কোথা যাবে > কোজ্জাবে বা কোথা থেকে > কোত্থেকে।

অল্পায়াসপ্রবণতা—শব্দের উচ্চারণকে সহজ করার জন্য অনেকসময় নানাবিধ উপায়ে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে (জন্ম > জনম), অন্যধ্বনি জুড়ে (স্কুল > ইস্কুল), দুটি আলাদা ব্যঞ্জনকে একই ব্যঞ্জনে পরিণত করে (কর্ম > কম্মো) বা ধ্বনি লুপ্ত করে (মধু > মউ)।

শ্বাসাঘাত—নিজের অজান্তে শব্দের মধ্যে সঠিক জায়গায় শ্বাসাঘাত না পড়লে, ধ্বনিতে পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন—গামোছা > গাম্‌ছা, অলাবা > লাউ।

(গ) বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ :

অজ্ঞতা—অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় যথাযথ উচ্চারণে অক্ষমতা আসে। না জেনে ভুল শব্দকে শুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করলেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন—ব্যাজ (Badge) > ব্যাচ, উচ্চারণ > উশ্চারণ।

ভাবপ্রবণতা—আবেগাতিশয্যে অনেক সময় শব্দে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন—সবাই > সব্বাই, ছোট > ছোট্ট, সকলে > সক্কলে, একেবারে > এক্কেবারে।

বিশুদ্ধিপ্রবণতা—অনেকসময় শব্দকে সাধুভাষার উপযোগী বা শিষ্টতর রূপ দিতে গিয়ে, শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে, তার ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—পুষ্ট > পুরুষ্ট।

ছন্দ রক্ষা—কবিতায় ছন্দ বজায় রাখার জন্য অনেক সময় শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—স্নান> সিনান, মুক্ত > মুকুতা।

লোকনিরুক্তি—অপরিচিত বিদেশি শব্দকে নিজে ভাষার চেনা শব্দের সদৃশ করে উচ্চারণ করার চেষ্টায় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন—'হাঁসপাতাল' শব্দটি——Hospital'-কে 'হাঁস' ও 'পাতাল' শব্দের সাদৃশ্যে নিয়ে আসার ফলশ্রুতি।

সাদৃশ্য—কোনো দুটি সদৃশ শব্দের কোনো একটিতে যদি কোনো ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, তবে অপরটিতেও সেই পরিবর্তন ঘটবে, এই বোধ থেকে অপর শব্দটিতেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—'বৌ' আর 'বউড়ি' শব্দদুটি সমার্থক। এদেরই সাদৃশ্যে 'শাস' শব্দটিকে করা হয়ে 'শাসুড়ি', 'ঝি' হয়েছে 'ঝিউড়ি'।

৩০.৪ ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ প্রক্রিয়া

এইভাবে নানা কারণে শব্দস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন শব্দের মূল রূপ এবং পরিবর্তিত রূপের যদি একটি তালিকা তৈরি করেন, তবে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন—ধ্বনিগত পরিবর্তনের সাধারণ কয়েকটি প্রক্রিয়া শব্দগুলির ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে। আসুন, এবার আমরা এই সাধারণ প্রকিরয়া বা নিয়মগুলিকে লক্ষ করি। মূলত চারীটি নিয়মে বাংলা শব্দের যাবতীয় পরিবর্তনগুলিকে গুচ্ছবন্ধ করা সম্ভব, যে চারটি নিয়ম হ'ল নিম্নপ্রকার :—

(১) **ধ্বনির সংযোজন**—উচ্চারণের সুবিধার্থে বা সৌন্দর্যসাধনে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে নতুন কোনো ধ্বনি যুক্ত করা হয়। যেমন—স্পর্ধা > আস্পর্ধা, গ্লাস > গেলা, মিষ্ট > মিষ্টি।

(২) **ধ্বনির বিয়োজন**—উচ্চারণে দ্রুততায় বা অন্য ধ্বনিতে প্রবল শ্বাসসাঘাত পড়ায়, শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—উদ্ধার > ধার, কলিকাতা > কলকাতা, জল > জল্ ইত্যাদি। ধ্বনিলোপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত—যেকোন অবস্থানেই ঘটতে পারে।

(৩) **ধ্বনি পরিবর্তন**—উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেকসময় এক ধ্বনির পরিবর্তে অন্যধ্বনি ব্যবহার করে শব্দকে সহজতর রূপ দেওয়া হয়। যেমন—কর্ম > কম্মো (র > ম), জুতা > জুতো (আ > ও), কাক > কাগ (ক > গ)।

(৪) **ধ্বনির স্থানপরিবর্তন**—উচ্চারণের দ্রুততায় বা অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় শব্দস্থিত ধ্বনিদ্বয় পরস্পর স্থান বদল করে। যেমন—রিক্সা > রিসকা, মুকুট > মটুক।

৩০.৫ বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন

আপনি ধ্বনিপরিবর্তনের চারটি সূত্র দেখলেন। এইবার এই চারটি সূত্র অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ধারাটিকে সজ্জিত করে নিয়ে, আসুন তার গতিপ্রকৃতিটি বুঝে নেওয়া যাক।

১. স্বরধ্বনির সংযোজন ঃ

স্বরাগম ঃ উচ্চারণসৌন্দর্যের জন্য বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বরধ্বনি এনে বসাবার রীতিকে স্বরাগম বলা হয়। যেমন—

আদিস্বরাগম—স্ত্রী > ইস্ত্রি (প্রাকৃতে), স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম—একে বাংলা ব্যাকরণে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—ইন্দ্রা > ইন্দিরা, ভক্তি > ভকতি, ফিল্ম > ফিলিম, প্রীতি > পিরীতি।

অন্তস্বরাগম—দিশ > দিশা, কায় > কায়া, ট্যাকস > ট্যাকসো, মিষ্ট > মিষ্টি।

২. স্বরধ্বনির বিয়োজন ঃ

স্বরলোপ ঃ শব্দস্থিত স্বরধ্বনি অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায় দুর্বল শ্বাসাঘাত বা শ্বাসাঘাতহীনতার কারণে। এক্ষেত্রে লুপ্ত স্বরধ্বনি বাদে অন্য কোনো ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত পড়ে। এই রীতিটিকেই স্বরলোপ বলা হয়। এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনও শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত—তিনরকম অবস্থানেই ঘটতে পারে।

আদিস্বরলোপ—অভ্যন্তর > ভিতর, আনোনা > নোনা, উদুম্বুর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ—গামোছা > গাম্ছা, আমাড়া > আমড়া, ঘোড়াদৌড় > ঘোড়দৌড়।

অন্তস্বরলোপ— ফল > ফল্, ষট্ > ছয় > ছ', বৃদ্ধি > বাড়্, রাতি > রাত।

৩. স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ

স্বরসঙ্গাতি ঃ বাংলায়, বিশেষ করে মৌখিক বা চলিত বাংলায়, কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে লক্ষণীর পরিবর্তন হয়, বাংলার উচ্চারণগত সেই বিশিষ্ট রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গাতি চার প্রকার—

(ক) পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তীস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গাতি বলে। যেমন—জুতা > জুতো, ঠিকা > ঠিকে।

(খ) পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গাতি বলে। যেমন—অতি > ওতি, মিশে > মেশে।

(গ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গাতি বলে। যেমন—বিলাতি > বিলিতি।

(ঘ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বর উভয়েই যদি পারস্পরিক প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তাবে তাকে বলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গাতি। যেমন—(ঝোলা > ঝুলি)।

অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতি-জাত 'ই'-কার বা 'উ'-কার এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, সেই পরিবর্তনই হল অভিশ্রুতি। যেমন—মাছুয়া > মাইচ্ছা (অপিনিহিতি) > মেছো (অভিশ্রুতি), রাখিয়া > রাইখ্যা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)।

৪. স্বরধ্বনির স্থান-পরিবর্তন ঃ

অপিনিহিতি ঃ শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো 'ই'-কার বা 'উ'-কার থাকলে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। যেমন—আজি > আইজ, চারি > চাইর, গাছুয়া > গউচ্ছা, কন্যা > কইন্যা, বাক্য > বাইক্ক।

৩০.৬ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

বাংলা স্বরধ্বনির মত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকেও আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের ওই চারটি সূত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করেই এইবার পর্যালোচনা করব।

১. ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোজন ঃ

ব্যঞ্জনাগম : স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত করার প্রবণতা বাংলাভাষায় দেখা যায়। এই রীতিকে বলা হয় ব্যঞ্জনাগম। যেমন—

শব্দের আদিতে—ওঝা > রোজা, উপকথা > রূপকথা

শব্দের মধ্যে—বানর > বান্দর, মকদ্দমা > মোকর্দমা, অম্ল > অম্বল, পুষ্ট > পুরুষ্ট,

শব্দের শেষে—ছাই > ছালি, তাঐ > তালৈ

শ্রুতিধ্বনি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি নিলে যৌগিকস্বর উৎপন্ন না হলে, ওই দুই স্বরের মাঝখানে একটি অর্ধব্যঞ্জনের আগমন ঘটে। এইরকম ধ্বনির আগমকে শ্রুতিধ্বনি বলে। য, ব, হ ইত্যাদি ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি হিসেবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন—

কি করে খাই > কিয়ার খাই

যা + আ > যাওয়া ('ওয়া' আসলে অন্তঃস্থ 'ব' আ)

বিপুলা > বিউলা > বেহুলা

রাজকুল > রাউল > রাহুল

২. ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজন ঃ

ব্যঞ্জনলোপ : স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তস্থিত ব্যঞ্জন অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

আদি ব্যঞ্জন লোপ—স্থিত > থিতু, শ্মশান > মশান।

মধ্য ব্যঞ্জন লোপ—শৃগাল > শিয়াল, ফলাহার > ফলার, অন্ধকার > আঁধার।

অন্ত ব্যঞ্জন লোপ—কহি > কই, আম্র > আম, রাধিকা > রাই।

সমাক্ষরলোপ : পাশাপাশি অবস্থিত সদৃশ বা সমধ্বনির ব্যঞ্জন উচ্চারণ দ্রুততায় অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, যাকে বলা হয় সমাক্ষর লোপ।

যেমন—পটললতা > পলতা, পাটকাঠি > প্যাকাটি, মধ্যদেশীয়া > মদেশীয়া, বড়দাদা > বড়দা, ছোটকাকা > ছোটকা।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-পরিবর্তন ঃ

বিপর্যাস/বর্ণবিপর্যয় : শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিদ্বয় যদি পরস্পরের স্থান বিনিময় করে, তবে সেই রীতিটাকে বলা হয় বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয়।

যেমন—পিশাচ > পিচাশ, বারাণসী > বেনারস, হ্রদ > দহ, প্লাটুন > পল্টন।

৪. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঃ

সমীভবন : পাশাপাশি বা যুক্ত অবস্থায় থাকা দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনিকে সদৃশ বা একই ব্যঞ্জনে পরিণত করার যে প্রবণতা, তাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিন প্রকার—

(ক) পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি সমতা প্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন পদ্ম > পদ্দ, পক্ব > পক্ক।

(খ) পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন সম অবস্থায় এলে তাকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন—কর্ম > কম্মো, তর্ক > তক্কো, মূর্খ > মুখ্খু, সাতজন > সাজ্জন।

(গ) যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ব্যঞ্জনই পরস্পরের প্রভাবে বদলে গিয়ে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তখন তাকে বলা হয় অন্যোন্য সমীভবন। যেমন—অদ্য > অজ্জ > আজ, সত্য > সচ্চ (প্রাকৃতে)।

বিষমীভবন : শব্দস্থিত দুটি সদৃশ বা সমব্যঞ্জনের কোনো একটি যদি পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়াটি সমীভবনের বিপরীত বলা যায়। যেমন—শরীর > শরীল, লাল > নাল, মর্মর > মার্বল।

ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন : শব্দের অঘোষধ্বনিকে ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত করলে তাকে বলা হয় ঘোষীভবন। এরই বিপরীতক্রমে ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'লে, তাকে বলে অঘোষীভবন। যেমন—

ঘোষীভবন—কাক > কাগ (ক > গ), বাপবেটা > বাববেটা (প > ব)

অঘোষীভবন—গুলাব > গোলাপ (ব > প), বীজ > বীচি (জ > চ)

মহাপ্রাণীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন : কোনো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন যদি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তর লাভ করে তবে তাকে বলা হয় মহাপ্রাণীভবন। এরই উল্টোদিকে মহাপ্রাণ কোনো ব্যঞ্জন যদি অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে অল্পপ্রাণীভনব। যেমন—

মহাপ্রাণীভবন—কাঁটাল > কাঁঠাল (ট > ঠ), মস্তক > মাথা (ত > থ)

অল্পপ্রাণীভবন—সুখ > সুক (খ > ক), মধু > মদু (ধ > দ), শৃঙ্খল > শেকল (খ > ক)।

নাসিক্যীভবন ও বিনাসিক্যীভবন : নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ ও অনুনাসিক করে তোলে তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাসিক্যীভবন। যেমন—হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, কণ্টক > কাঁটা, সন্ধ্যা > সাঁঝ।

অনেক সময় নাসিক্যব্যঞ্জনের উপস্থিতি—লোপ ইত্যাদি ব্যতীতই শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে উঠতে পারে। একে বলা হয় স্বতঃ নাসিক্যীভবন। যেমন—পুস্তক > পুঁথি, ইষ্টক > ইঁট, পেচক > পেঁচা, যুথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ।

শব্দের নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে গিয়ে যদি অন্য কোনো ধ্বনিকে অনুনাসিক না করে তোলে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিনাসিক্যীভবন। যেমন—মঞ্চ > মাচা, কিঞ্চিৎ > কিছু, শৃঙ্খল > শিকল, অভ্যন্তর > ভিতর।

মূর্ধনীভবন : ঋ, র, ষ, ধ্বনি বা কোনো মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হ'লে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলা হয়। যেমন—বিকৃত > বিকট (ত > ট), তির্যক > টেরা, মৃত্তিকা > মাটি, দক্ষিণ > ডাহিন > ডান (দ > ড)।

অনেক সময় কোনো ধ্বনির প্রভাব ব্যতীতই দন্ত্যধ্বনির মূর্ধন্যীভবন ঘটে যাকে বলা হয় স্বতঃ মূর্ধন্যীভবন। যেমন—পততি > পড়ই > পড়ে, দংশক > ডাঁশা, বাল্‌তি > বাল্‌টি।

দ্বিত্বীভবন : শ্বাসাঘাতের কারণে, বক্তার আবেগপ্রাবল্যে বা গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে একক ব্যঞ্জনকে অনেক সময় যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত করা হয়, যাকে বলে দ্বিত্বীভবন। যেমন—সকাল > সক্কাল, ছোট > ছোট্ট, সবাই > সব্বাই।

এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনির আরও বহুবিধ পরিবর্তন ভাষাদেহের বহু অংশেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

উষ্মীভবন—ফুল > ফুল, জানতে > জানতে

সকারীভবন—গাছতলা > গাস্‌তলা, পাঁচসের > পাঁসসের

রকারীভবন—পঞ্চদশ > পন্নডহ > পন, দ্বাদশ > বারহ > বার।

তালব্যীভবন—মধ্য > মাঝ, চিকিৎসা > চিকিচ্ছে।

৩০.৭ সারাংশ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছেন যে, কোনো ভাষার ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হলেও শব্দে বা বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তার উপর তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাব কার্যকর হয়। আসুন, সংক্ষেপে আরেকবার সমগ্র বিষয়টিকে ঝালিয়ে নিই—

ধ্বনির পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তখনই যখন সেটি শব্দ বা বাক্যে, অন্যান্য ধ্বনির প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়।

শব্দস্থিত ধ্বনি তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।

ভাষাব্যবহারকারী মানুষের নানা শারীরিক ক্রিয়া, মানসিক অবস্থা বা ভাষাপরিবেশ ধ্বনিপরিবর্তন ঘটাবার অন্যতম কারণ।

ধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের যাবতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে আমরা সাধারণ চারটি সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারি।

তবে এইসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে ধ্বনি পরিবর্তনের এই যে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লে, এগুলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। এই প্রক্রিয়া বা ধারাগুলি অন্যভাষায় নাও থাকতে পারে।

৩০.৮ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন ঃ

সমীভবন ও দ্বিত্বীভবন, স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি, স্বরাগম ও স্বরভক্তি, ঘোষীভনব ও অল্পপ্রাণীভবন।

২। সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করুন (দৃষ্টান্ত সহ) ঃ

অভিশ্রুতি, স্বরাগম, মূর্ধন্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অঘোষীভবন, বিষমীভবন।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কার্যকর হয়েছে তা নির্দেশ করুন ঃ

ধর্ম > ধম্ম, মুক্তা > মুকুতা, মিষ্ট > মিষ্টি, একেবারে > এক্কেবারে, রাতি > রাইত > রাত, আম্র > আম, মেজদিদি > মেজদি, কাঁটাল > কাঁঠাল।

৪। দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করুন ঃ

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনের সক্রিয় বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ।

(খ) ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ সূত্রাবলী।

(গ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজনমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।

(ঘ) বাংলা স্বরধ্বনির রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।

(ঙ) বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-বিনিময়মূলক পরিবর্তন।

৩০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভাষাবিদ্যা পরিচয়।